অবিরাম বিদ্যুৎ.....

বিজয় উল্লাস

বিজয় আমার অনুপ্রেরণা

তুমি আবার এসেছো ফিরে
এই শ্যামল বাংলার মাঝে
লাল সবুজের গৌরব
বিজয়ে নিশান উড়ে

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠগণ

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মতিউর রহমান

ক্যাপ্টেন
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার
মোহাম্মদ রুহুল আমিন

সিপাহী
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

ল্যান্স নায়েক
মুন্সি আব্দুর রউফ

ল্যান্স নায়েক
নূর মোহাম্মদ শেখ

সিপাহী
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

বিজয়ের পতাকা উড়ছে সারা দেশে মাতো বাঙালি বিজয়ের উল্লাসে

বাণী

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষে প্রতিবারের ন্যায় আমি ওজোপাডিকো'র কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের এ দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদকে, স্মরণ করছি দুই লক্ষের অধিক সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন স্বদেশভূমি পেয়েছি। সেই সাথে এসেছে আমাদের মহান বিজয় দিবস-১৬ই ডিসেম্বর। বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে আরও অর্থবহ করতে ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আগামী দিনের বাংলাদেশ হোক জাতির পিতার কাঙ্খিত সোনার বাংলা যেখানে সকলের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার থাকবে অবারিত।

প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ওজোপাডিকো, খুলনা।

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর জাতীয় মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাষনের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির মুক্তির ঘোষণা ফুটে উঠে।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় দুইশত বছরের উপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল ভেঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

৫০তম মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষে গৃহীত কর্মসূচির আওতায় একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ওজোপাডিকো কর্তৃপক্ষ। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে "বিজয় উল্লাস-২০২০" স্মরণিকায় যাঁরা লেখা দিয়েছেন, তাঁরা কেউই পেশাদার লেখক নন এবং অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে এ স্মরণিকাটি প্রকাশ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই সকলকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আগামী দিনে বর্ধিত কলেবরে আরও পরিশীলিত আকারে আপনাদের সহযোগিতায় স্মরণিকা প্রকাশের ইচ্ছা রইলো। স্মরণিকা সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তাসহ এ প্রকাশনায় লেখা দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন-তাঁদের সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রকৌশলী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সম্পাদক স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি
ও
প্রধান প্রকৌশলী (ইএসসিএন্ডএস),
ওজোপাডিকো, খুলনা

সূচীপত্র

মুজিব শত বর্ষে বিজয় দিবস	০৪-০৫
বিজয় নিশান	০৬
আগুন	০৬
বিজয়ের দেশে	০৭
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ	০৭
বিজয় দেখেছি, বিজয় দেখছি না	০৮
বিজয়ের পুঁথি	০৯
বিজয় এলো	০৯
রক্তস্নাত বিজয়	১০-১১
শিরোমনির ট্যাংক যুদ্ধ	১২-১৩
১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস	১৪-১৫
মা	১৫
মুক্তি	১৬-১৭
জয় উল্লাসেও কাঁন্দে মন	১৮
বিজয় কান্না	১৮

উদ্ভাবনের নতুন দেশ আলোকিত বাংলাদেশ

মুজিব শত বর্ষে বিজয় দিবস

-প্রকৌশলী মোঃ সাইফুজ্জামান*

বছর পেরিয়ে প্রতিবার ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস আসে, আবার চলে যায়। কিন্তু এবারের ২০২০ সালের বিজয় দিবসের ভিন্ন গুরুত্ব রয়েছে- কেননা এবারের বিজয় দিবস মুজিব শতবর্ষের বিজয় দিবস। ভিন্ন বাস্তবতায় এবারের করোনা পরিস্থিতিতে মুজিব শতবর্ষে বিজয় দিবস যেমন ভাবে উদযাপন কথা ছিল তা হয়তো আমরা করতে পারিনি, তবে এবারের বিজয় দিবসের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এবারের বিজয় দিবস আমাদের ৫০তম বিজয় দিবস। ঠিক ৪৯ বছর পূর্বে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল। আলোচ্য লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় এবারের বিজয় দিবসের গুরুত্ব ও মুজিব শতবর্ষ।

বিজয় দিবস আমরা উদযাপন করি ছোট-বড় কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। স্মৃতিসৌধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি পুষ্পার্ঘ্যের মাধ্যমে, কখনো আলোচনা সভা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অথবা মুক্তিযোদ্ধাগণকে সংবর্ধনার মাধ্যমে কিংবা বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে শপথ গ্রহণ করে। বাস্তবে কতজন বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করি? এবার ভিন্নভাবে চিন্তা করি- এবারের বিজয় দিবস মুজিব শতবর্ষের বিজয় দিবস ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে কি? কিংবা কেন? আর কেনই বা মুজিব শতবর্ষ এমন ঘটা করে উদযাপন করা হচ্ছে?

উপরের প্রতিটি 'কেন' এর জবাব জানা প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রয়োজন।

আমরা আজ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। একটি স্বাধীন ভূ-খন্ড, জাতিসত্তা, একটি পতাকা, একটি জাতীয় সংগীত বাঙালি জাতির ছিল না। কিন্তু এগুলো সবই অর্জন হয়েছে। সেই ইতিহাস হয়তো সকলের জানা। কিন্তু নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানেনা কিভাবে আমাদের স্বাধীনতার বীজ বপন হয়েছিল। কিভাবে স্বাধীনতার স্বপ্ন বাঙালি জাতি দেখেছিল। আর এই স্বপ্নের রূপকার কে ছিলেন? কিভাবে দেশের জন্য ৩০ লক্ষ শহীদ বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের প্রিয়দেশকে মুক্ত করেছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। কিভাবে তারা আত্মত্যাগ করেছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। প্রায় দু'শ বছরের উপনিবেশি আর পাকিস্তানী শোষণের পর এদেশকে বাঙালি নিজের মতো করে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছে- যার পিছনে আছে ত্যাগ, রক্তদান; কিন্তু যে স্বপ্নে বিভোর হয়ে শহীদ হয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে স্বাধীনতার ৪৯ বছর পরেও আমরা কি পেরেছি তাঁদের স্বপ্নের প্রতিদান দিতে?

উত্তর হলো- 'না'। কিন্তু আমাদের অর্জন কম নয়। তবে এই অর্জনে বার বার আমাদেরকে আঘাত করেছে বিভিন্ন রং-এ আসা ৭১'-এর পরাজিত শত্রুরা। কখনও উর্দি চাপিয়ে, কখনো বা অন্য রং-এ। আমরা আজ অনেকেই স্বাধীনতা বিজয়, বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু এগুলোকে নতুনভাবে উপলব্ধি করি। কিন্তু এই বাংলাদেশে যেমন একদিকে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অপরাধী মনে করা হতো একই সাথে যুদ্ধাপরাধীরা জাতীয় পতাকা গাড়ীতে টানিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে দেশময়। অথচ এ পতাকার বিরোধী তারা। এর পেছনে যাদের অবদান- তারা কারা?

এসব প্রশ্নের ফয়সালা হওয়া দরকার। না হলে শহীদদের রক্তের ঋণ কোনদিন পরিশোধ হবে না। এবার আসি মূল প্রতিপাদ্যে।

আমাদের স্মরণ রাখা দরকার এদেশকে স্বাধীন করার জন্য, বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের প্রায় ১৩ (তের) টি বছর বিভিন্ন সময়ে জেল খেটেছেন, অমানসিক নির্যাতন ভোগ করেছেন, অবশেষে কুচক্রীদের হাতে সপরিবারে জীবন দিয়ে গেলেন। তাঁর আজ জন্মশতবার্ষিকীর বছর চলছে। সেই শুভক্ষণকে সামনে নিয়ে একই সাথে আসছে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি। যেহেতু বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম রচিত হয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্দীপ্ত হয়েছিল- তাই বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে বঙ্গবন্ধু এত আলোচিত, বঙ্গবন্ধু এত উদযাপিত, বঙ্গবন্ধু এত প্রাসঙ্গিক। একই সাথে বিজয় আমাদেরকে যা দিয়েছে তা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। স্বাধীনতার মূল্য মাথাপিছু আয় দিয়ে বিচার করা চলে না, স্বাধীনতার মূল্য অন্য বাটখারায় মাপা যায়না। স্বাধীনতার মূল্যায়ন মুক্তির স্বাদে হতে হয়। পৃথিবীর আর কোন কিছুর সাথে মুক্তি আর স্বাধীনতা কিংবা বিজয় মূল্যায়িত হতে পারে না। আজ থেকে ৪৯ বছর আগে যে বিজয় আমাদের অর্জিত হয়েছে তার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির অগ্রযাত্রা এই অগ্রযাত্রার মাধ্যমে বাঙালি জাতি একদিন বিশ্বসভায় স্থান করে নেবে। বিভিন্ন সময়ে যে অগ্রযাত্রা ব্যহত হয়েছে, তা শুধুমাত্র দেশী-বিদেশী পরাজিত শত্রুর ষড়যন্ত্রের ফসল। বিজয়ের এই ৫০তম বছর পূর্তিতে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবো ভাষা শহীদদের, স্মরণ করবো বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক ও মুক্তির আন্দোলনে আত্মাহুতি দানকারী শহীদদের, স্মরণ করবো মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী ৩০ লক্ষ শহীদগণকে, একই সাথে স্মরণ করবো বঙ্গবন্ধুসহ ৭৫'এর ১৫ই আগস্ট, ৩রা নভেম্বরে যারা রক্ত দিয়েছেন দেশের প্রয়োজনে, একই সাথে স্মরণ করবো ২১শে আগস্টের শহীদগণকে। একই সাথে আমরা শপথ নিবো বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে, বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা রক্ত/জীবন দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন, মা-বোনের সম্ভ্রম হারিয়েছেন- তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আমরা বিনির্মাণ করবোই।

এই হোক আমাদের চূড়ান্ত শপথ।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
সদর দপ্তর, ওজোপাডিকো, খুলনা।

বিজয় নিশান

কামরুজ্জামান*

কতটা যুগ পেরিয়ে গেল
বিজয় এসেছে দেশে,
রক্তের গন্ধ আছে এখনো,
আকাশে বাতাসে ভেসে।
লাখো শহীদের জীবনের বিনিময়ে
স্বাধীনতা পেয়েছে জনতা,
উন্নয়নের কাজে দিচ্ছে বাঁধা
স্বাধীনতা বিরোধী যারা।
রক্ত পিপাসু ড্রাকুলারা সব
নেমেছে রক্ত শোষনে,
সহজ সরল জনতার দল
পুড়ে যাচ্ছে দহনে।
অসৎ লোকের কালো সে থাবায়
ধ্বংস সবই অর্জন,
রুখতে হবে এদেরকে আর
করতে হবে বর্জন
এসো সবে মিলে হাত ধরাধরি করি
শক্ত হয়ে দাঁড়াই,
অপশক্তিকে রুখে দিয়ে মোরা
বিজয় নিশান উড়াই।।

*সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ)
আহিদ খুলনা

আগুন

যারিন তাসনিম*

আগুন আদিম যুগের আবিষ্কার
আগুনের নেই কোন আকার।
আগুন বড়-ই নির্দয়
নরম হয়নি হৃদয়
যাকে পায় তাকে মারে
পাকিস্তানিরাও হার মানে।
স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আজ
আগুন দেখায় তার কাজ।
আগুন খুব-ই উপকারী
কার অভিশাপে হয় ধ্বংসকারী।
২০১০ সালে নিমতলা ট্রাজেডী
২০১৯ এর চকবাজারের জানো কি?
২২তলা ভবন এফ আরে
বনানীতে কত ধ্বংশের রকম ফেরে,
আগুন সব পুড়িয়ে করেছে ছারখার
জিজ্ঞাসা করে স্বজন হারিয়েছে কার কার।
বাবা-মাকে খুঁজতে ছোট শিশু
এসেছে যে মামার কোলে,
সেতো জানে না বাবা-মা নেই
মৃত্যুর কোলে পড়েছে যে ঢলে।
এফ আর টাওয়ারের সকল কর্মী
সেদিন সবাই ছিল মৃত্যুর পথযাত্রী,
কষ্ট পেয়েছে সবাই ধোঁয়ায়
কাজে এসেছে বা আসেনি কোন দোয়ায়।
কোন বাবার কাঁধে সন্তানের লাশের বোঝা
কোন বাবার হয়তো শেষ হয়নি সন্তানকে খোঁজা

*৯ম শ্রেণী
পিতা- মোহাঃ তোফাজ্জেল হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী, স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প।

বিজয়ের দেশে

প্রকৌশলী মোঃ আরিফুর রহমান*

বঙ্গোপসাগরের শোষিত নোনা তীরে
বঙ্গবন্ধুর ভাষণের শ্রোতার ভীড়ে
শোষণ ও নির্যাতনের থেকে মুক্ত করে
বীর-বাঙালীরা ছুটছে তেড়ে, সজোরে
রবীন্দ্রনাথ নজরুলের ছন্দ সুরে
অনন্তর অন্তরের গহীনে বঙ্গ-রে
জয়ের তরঙ্গে তরঙ্গে কর্ণ-কুহরে
মনে-প্রানের অন্তরে বাংলা রে, বাংলা রে।

জয়ের আবেশে সবুজ ঘন আকাশে
মহামানবের লাশে জয় ভালোবেসে
আনন্দের রেশে, এই বিজয়ের মাসে
আমি আছি বাংলাদেশে, বাংলা ভালোবেসে
লাল সবুজের দেশে, বিজয়ের দেশে
লাল সবুজের দেশে, বিজয়ের দেশে।।

*প্রকল্প পরিচালক (EAUPDSP)
ওজোপাডিকোলিঃ, খুলনা।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

মোঃ মোজাম্মেল হক খান*

স্বাধীনতার স্বাদ নাইতো এর শেষ,
বঙ্গবন্ধু মানেই স্বাধীন বাংলাদেশ।
পরাজয় না মেনে গড়ে ছিলে রাষ্ট্র,
স্বীকৃতি দিয়েছিল সারা বিশ্ব।
নিজস্বার্থ দেখোনি তুমি, দেখেছিলে মুক্তি,
তুমি মানেই বাংলাদেশ, এটাই তার যুক্তি।
স্রষ্টার সৃষ্টি তুমি গড়েছিলে বাংলাদেশ,
জাতির মনে আছো তুমি নেইতো এর শেষ।
বিশ্বের মানচিত্রে এঁকে ছিলে এই দেশ,
বঙ্গবন্ধু মানেই স্বাধীন বাংলাদেশ।

*সহকারী প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
ওজোপাডিকোলিঃ,কুষ্টিয়া ।

বিজয় দেখেছি, বিজয় দেখছি না

আল্ মাসুদ রানা অপু*

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। সারা দেশে উড়েছিল বিজয়ের পতাকা। এসেছে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের মাহেন্দ্রক্ষণ।

নয় মাসের যুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনতে অনেক হারাতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। লাখো শহিদের রক্ত কি বৃথা গেছে? নাকি যে আকাঙ্খা নিয়ে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল লাখো মানুষ, তাদের সব আকাঙ্খা পূরণ হয়েছে? এক কথায় কোনো প্রশ্নের উত্তরই দেয়া সম্ভব নয়।

বিজয়ের চার বছর পূর্তির আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্য এবং চার জাতীয় নেতাকে হত্যার মাধ্যমে দেশের রাজনীতিতে যে ঘনঘোর লেগেছিল, সেই ঘনঘোর বিজয়ের পঞ্চাশ বছরেও কাটেনি।

বরং যে দেশের মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সামনে রেখে শুরু করা স্বাধিকারের আন্দোলনকে স্বাধীনতায় রূপ দিয়েছিল, সে দেশের মানুষের মাঝে বপন করা হয়েছে 'বাঙালি না বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'-এর দ্বন্দ্ব।

বিশ্বের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জনসংখ্যা বিবেচনায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের দেশ ভারতসহ আরো কিছু দেশের মতো বাংলাদেশও স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর সাংবিধানিকভাবেও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হয়েছে। তবে ক্ষমতার পালাবদলে শাসকের ইচ্ছাপূরণের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার পাশে রাষ্ট্রধর্মও যোগ হয়েছে সংবিধানে।

খুঁজলে আরো বিতর্ক, আরো বৈপরিত্যের উল্লেখ করা যাবে, যেগুলো ৭১'-এর শহীদ, মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী সাধারণ মানুষদের স্বপ্নে ছিল না। সেখানে উদার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা নিশ্চয়ই আসবে। অবাধ ভোটের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব হতে পারে। এছাড়া '৫২-র ভাষা আন্দোলন এবং ৭১'-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যোগফলে ভাষা এবং সংস্কৃতিকে সব জায়গায় অগ্রাধিকার দেয়ায় সাফল্য-ব্যর্থতার প্রসঙ্গটিও খুব বড় হয়ে উঠবে অবশ্যই।

এসব অপ্রাপ্তিকে সাথে নিয়েই করোনাকালে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভলগ্নে বাংলাদেশ। এ দেশে বিশ্বব্যাংক তাকিয়ে দেখে পদ্মা সেতু। দুর্নীতির ধারাবাহিকতা বা আরো বাড়বাড়ন্তের মাঝেও একটি বিষয়ে অন্তত খুব গর্ব করতে পারে বাংলাদেশ অর্থনীতির অনেক সূচকে ৭১'-এর শত্রুপক্ষ পাকিস্তানের চেয়ে তো বটেই, এমনকি মিত্র ভারতের চেয়েও অনেক এগিয়ে বাংলাদেশ।

* সহকারী শিক্ষক
(তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)
ওজোপাডিকো হাই স্কুল
শেখপাড়া, খুলনা।

"বিজয়ের পুঁথি"

সালমা আক্তার*

তোমাকে পেয়েছি শেখ মুজিবের চোখে অশনি আলোকে
তোমাকে পেয়েছি শীতের শীর্ণা নদী
ভোরের কুয়াশা ঢাকা রুপসার তীরে।
তোমাকে পেয়েছি শত বীরঙ্গনার সম্ভ্রমের বিনিময়ে
তোমাকে পেয়েছি বাংলার দামাল সন্তানের
ম্লান একাদশী ভরা দু'টো ঠোঁটের হাসিতে।
তোমাকে পেয়েছি বহু দিন ধরে,
হায়েনার পরানো শিকল খুলে।
তোমাকে পেয়েছি ভেঙ্গে পড়া পুরানো রাজবাড়ির দেয়ালে
রোদের শ্যাওলা মাখা বুড়ো বটের মূলে
সরিষা বোনা ক্ষেতের পাশে।
অবশেষে বাংলার ত্রিশ লক্ষ
শহীদের রক্তের বিনিময়ে।
তুমি বাংলার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ডায়েরি
হারানো সন্তান ফিরে পাওয়ার আনন্দ।

*জুনিয়র শিক্ষক
ওজোপাডিকো হাই স্কুল
শেখপাড়া, খুলনা।

বিজয় এলো

তাহমিন হোসেন*

বিজয় এলো ৩০ লক্ষ
শহীদের রক্তের তরে
বিজয় এলো মুক্তি যোদ্ধার
যুদ্ধের বিনিময়ে।
বিজয় এলো বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের তরে
বিজয় এলো ৯ মাস
যুদ্ধের পরে।
বিজয় আমাদের দেয় মুক্তি
ও প্রাণ ভরা আশা,
কত মানুষ যুদ্ধ করে
দিল আমাদের মুক্তি,
আমরা এখন মুক্ত যেমন
মুক্ত হাওয়ায় বাঁচি।
মুক্ত দেশে ঘুরে বেড়ায়
সহজ সরল মানুষ।
মুক্তি পেয়ে আমরা সবাই
মাতি খেলার তরে,
৯ মাস শান্তি করে
থাকতে পারিনি ঘরে,
হানাদারের আক্রমণে।

*৩য় শ্রেণী
পিতা- মোহাঃ তোফাজ্জেল হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী,
স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প।
মাতা- মোসাঃ সেফালী খাতুন

রক্তস্নাত বিজয়

মোঃ শাহিন মোল্যা*

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের এক আনন্দ ও গৌরবময় দিন। দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিতে এ দিনে আমাদের প্রিয় স্বদেশ দখলদার মুক্ত হয়। এ দিনেই বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই দিনটি বাঙালি জাতির জীবনে সর্বোচ্চ গৌরবের একটি অবিস্মরণীয় দিন।

জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এই বিজয় অর্জিত হয়। যতদিন পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি জাতি থাকবে ততদিন এই দিনটির গুরুত্ব ও সম্মান অক্ষুন্ন থাকবে।

বাঙালি জাতির ইতিহাস লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস, আত্মত্যাগের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পথ ধরেই বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খলা ভাঙতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলের অবসানের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে প্রথম থেকেই শাসন, শোষণ ও পীড়ন করতে থাকে।

এই শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি একে একে গড়ে তোলে আন্দোলন-সংগ্রাম। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচনে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে বাঙালি চূড়ান্ত বিজয়ের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

এসব আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ও নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির যে আন্দোলন শুরু হয় ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়। যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন।

তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে, যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকে বাঙালি জাতি। ২৫ মার্চ কালো রাতে নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, শুরু করে গণহত্যা।

এই প্রেক্ষাপটে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। এরপর পরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নেয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে চলে এই যুদ্ধ। পাক হানাদার বাহিনী বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে ভেঙে দিতে শুরু করে বর্বর গণহত্যা। গণহত্যার পাশাপাশি নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে

দেয় হানাদাররা।

বাংলাদেশ পরিণত হয় ধ্বংস স্তুপে। আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অদম্য সাহস ও জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, নারীসহ সব শ্রেণী-পেশার সর্বস্তরের বাঙালি।

মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এগিয়ে আসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুক্তিকামী মানুষ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হন। সম্ভ্রম হারায় দুই লাখের বেশি মা-বোন।

বাঙালি জাতির মরণপণ যুদ্ধ এবং দুর্বার প্রতিরোধের মুখে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা পরাজয়ের চূড়ান্ত পর্যায় বুঝতে পেরে বিজয়ের দুই দিন আগে জাতির সূর্য সন্তান বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যা করে। এতেও সহযোগিতা ও সরাসরি অংশ নেয় এ দেশীয় রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনী ও শান্তি কমিটির সদস্যরা।

অবশেষে বাঙালির দুর্বার প্রতিরোধের মুখে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্য দিয়েই বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পায় নতুন স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ।

প্রতিবছর বিশেষ মর্যাদা নিয়ে জাতির সামনে হাজির হয় বিজয় দিবস। এ দিবসটি তাই আমাদের হৃদয়ে যেমন আনন্দ-বেদনার সঞ্চার করে, তেমনি নতুন চেতনায়ও জাগ্রত করে। সেই সঙ্গে দেশ ও জাতিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার কাজও আমাদের করতে হবে। যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে এ বিজয় আমরা অর্জন করেছি, সেই বিজয়কে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের দেশ গড়ার শপথ নিতে হবে।

* সহকারী শিক্ষক
(ব্যবসায় শিক্ষা)
ওজোপাডিকো হাই স্কুল, খুলনা

চিত্র ঃ বিজয় দিবস

জান্নাতুল মাওয়া
শ্রেণী: দ্বিতীয়
মাতা: বেনজির হুমায়রা
জুনিয়র শিক্ষক, ওজোপাডিকো

শিরোমনির ট্যাংক যুদ্ধ

লিটন মুন্সী*

আমরা সকলেই জানি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই মাতৃভূমি মুক্ত করে বিজয় ছিনিয়ে আনি। নয় মাস যাবত মুক্তিকামী মানুষ ছাত্র-জনতা এক হয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে নতুন সূর্য জাতীকে উপহার দিয়েছে। যদিও ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর আত্মসমার্পনের মধ্য দিয়ে দেশ মুক্ত হয়, তথাপিও অনেক জায়গা ১৬ই ডিসেম্বরের পরে শত্রু মুক্ত হয়। যেমন খুলনা শহরের খানজাহানাবাদ থানার অন্তর্গত শিরোমনি এলাকা।

১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর ৯ম পদাতিক ডিভিশনের ১০৭ তম ব্রিগেড এর দায়িত্বে ছিল যশোর সেনানিবাস। ডিসেম্বের মাসে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর তখন শোচনীয় অবস্থা। মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহিত এক হয়ে যৌথবাহিনী গঠন করে। আর এই বাহিনীর হাতে পাক-হানাদার বাহিনী একের পর এক নাস্তা-নাবুদ হতে থাকে। আর যৌথ বাহিনীও একের পর এক জনপদ শত্রু মুক্ত করতে থাকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর ছিল কোলকাতায়। আর সে কারনে বৃহত্তর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করে। ৭ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী যশোর সেনাঘাঁটি দখল করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু তারা দেখতে পায় যে, যশোর সেনানিবাস সম্পূর্ণ রূপে খালি। কোথাও কেউ নাই। যশোর সেনানিবাস ছিল তৎকালীন সময়ে দক্ষিন বাংলায় পাক-বাহিনীর সুরক্ষিত ঘাটি। এমন কঠিন প্রতিরক্ষায় ঘেরা সেনানিবাস দখলে নেওয়ার জন্য যৌথবাহিনীর প্রস্তুতি ছিল দেখার মত। কারন তাদের ঠেকিয়ে রাখার মত অস্ত্র ও রসদ সেখানে মজুদ ছিল। এখান থেকে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ যুদ্ধের জন্য আশেপাশের এলাকায় পাঠানো হতো। অথচ সেই পাক-বাহিনীর দূর্ভেদ্য যশোর সেনানিবাস একরকম বিনা বাঁধায় মিত্র বাহিনীর দখলে আসে। তারা সেনানিবাসটি পরিত্যাক্ত অবস্থায় দখল করে। শত্রু বাহিনী তখন পিছু হটে গেছে। প্রশ্ন হলো পাকবাহিনী কেন এমনটা করলো? কারন পাকবাহিনী যশোরের গরিবপুর এলাকায় মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাদের মনোবল হারিয়ে গিয়েছিল। জানা গেল পাকবাহিনী গরিবপুর যুদ্ধে হেরে গিয়ে তারা পিছু হটে খুলনা শহরের শিরোমনি এলাকায় অবস্থান নিয়েছে।

কয়েকটি কারনে তারা তাদের সুরক্ষিত দূর্গ ছেড়ে পিছু হটেছিল। তাদের মধ্যে কারনগুলি ছিল, ১০৭ ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার হায়াত ভেবে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭ম নৌবহর খুব তাড়াতাড়িই এই এলাকায় এস পড়বে। আর তারা মোংলা বন্দর দিয়ে প্রবেশ করে রূপসা নদীতে আসবে এবং তাদের উদ্ধার করবে। আর তাই তারা ভৈরব নদীর আশে-পাশে শক্ত অবস্থান নেয়। আরেকটি কারন খুলনা শহরকে বলা হয় শিল্পনগরী। প্রচুর শিল্প-কলকারখানা থাকায় শিরোমনি ছিল নিরাপদে অবস্থান নেওয়ার আদর্শ জায়গা। তারা এই সকল কারখানার উচুঁ ভবনগুলিতে প্রতিরক্ষামুলক অবস্থান নেয়। আর এই এলাকা আগে থেকেই পাক-বাহিনীর কাছে পরিচিত ছিল।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ থেকে ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে শিরোমনি এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পাক-বাহিনী তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সু-সংহত করে। ইস্টার্ন জুট মিল, আলীম জুট মিল, আফিল জুট মিল সহ আটরা-গিলাতলায় তারা তাদের দূর্গ তৈরী করে। শিরোমনিস্থ ক্যাবল ফ্যাক্টরি ছিল তাদের সদর দপ্তর। স্থানীয় কোনো এলাকাই তাদের নজরের আওতার বাহিরে ছিলনা।

পাক-বাহিনীর কাছে ছিল ৩২টি শেরম্যান ট্যাংক, ২টি এম ২৪ চাফি ট্যাংক, ১৫০টি আর্টিলারী, ৪০০ কমান্ডো সৈন্য, প্রায় ৫,০০০ নিয়মিত পদাতিক বাহিনী আর ১৫০ জন রাজাকার। এছাড়া এলাকার মধ্যে কয়েক গজ পর পর পাক সেনাদের বাঙ্কার, ট্রেঞ্চ, মাইন ফিল্ড, ক্যামোফেজ তৈরী করে সম্পূর্ণ এলাকাটি দূর্ভেদ্য দূর্গ হিসাবে গড়ে তোলে।

যৌথ বাহিনী ১০ই ডিসেম্বর থেকে ১২ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর ফুলতলা অবস্থানে হামলা চালায়। ধীরে ধীরে যৌথ বাহিনী চারি দিক থেকে পাক বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। ১৩ই ডিসেম্বের শুরু হয় শিরোমনি দখলের যুদ্ধ। এই দিন প্রচন্ড গোলাগুলিতে শিরোমনি কেঁপে ওঠে। এত কিছু পরেও পাকসেনাদের তেমন কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয় নাই।

যৌথ বাহিনী ভারতীয় বিমান বাহিনীর সাহায্য চায়। দুই দিন ধরে শিরোমনিস্থ পাক অবস্থান লক্ষ করে বিমান হামলা করা হয়। বিমান হামলার পর পাক সেনাদের সাড়া-শব্দ না পাওয়ার যৌথ বাহিনীর ধারনা হয় যে, পাক সেনারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু যৌথ বাহিনীর এই ধারনা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

১৩ই ডিসেম্বের ভারতীয় সেনা বাহিনীর রাজপুত রেজিমেন্ট এস যুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। ভারতীয় সেনা বাহিনী ভৈরব নদীতে অস্থায়ী ভাসমান সেতু নির্মাণ করে, যাতে আশেপাশের এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা এস যুদ্ধে যোগ দিতে পারে। ১৪ই ডিসেম্বের যৌথ বাহিনীর দুই কর্মকর্তা মেজর মাহেন্দ্র সিং ও মেজর গনি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে পাক সেনাদের সদর দপ্তর ক্যাবল ফ্যাক্টরীর দিকে অগ্রসর হয়। বাদামতলায় আসা মাত্র তাদের গাড়ী বহর পাক সেনাদের পাতা ফাঁদে পড়ে। যুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনীর ২৫০জন থেকে ৩০০ জন সৈন্য নিহত হন। মেজর মাহেন্দ্র সিং কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন। ১৫ই ডিসেম্বের পর্যন্ত পাক বাহিনী তাদের যোগাযোগ দপ্তর, রাজাকার ক্যাম্প, অস্ত্রাগার, গোলাবারুদসহ কয়েকটি ট্রাক এবং ৪টি ট্যাংক হারায়। এরপরও পাক বাহিনী শিরোমনির মাটি কামড়ে পড়ে ছিল। সারাদিন যুদ্ধ চলতে থাকে, মিত্র বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহন করেন মেজর মঞ্জুর।

মেজর মঞ্জুর দায়িত্ব গ্রহনের পর প্রতিজ্ঞা করেন তিনি যুদ্ধ জয় না করে ফিরবেন না। ১৫ই ডিসেম্বের যৌথ বাহিনী তেমন সাফল্য না পেলেও শিরোমনিতে তাদের অবস্থান সু-সংহত করে। জেনারেল নিয়াজি ১৬ই ডিসেম্বের ঢাকায় আত্মসমার্পন করলেও ব্রিগেডিয়ার হায়াত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এদিন মেজর মঞ্জুর সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহন করেন। ৭টি ভাগে মুক্তিবাহিনী বিভক্ত হয়ে পাকবাহিনীর উপর হামলা শুরু করে। এইদিন মেজর মঞ্জুর ২টি পিটি ট্যাংকের পেছনে ১২ জন কমান্ডো নিয়ে পাকসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাথে আরো ৬টি ট্যাংক পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ফ্রন্ট লাইনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুয়াশার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা তাদেও অসীম সাহস নিয়ে পাক-সেনাদের মাঝে ঢুকে পড়েন। পেছন থেকে শুরু হয় মিত্রবাহিনীর আর্টিলারী বাহিনীর গোলা হামলা।

পাক বাহিনীর ২৫টি ট্যাংক ও শত শত মর্টারের গোলার মধ্যে মুক্তি বাহিনী পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহের মাঝে ঢুকে পরে। নিজেদের ট্যাংকের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে পাকসেনাদের হামলা করে। হাতে থাকা অস্ত্র দিয়ে পাকসেনাদের গুলি করতে থাকে, গ্রেনেড ছুড়ে পাকবাহিনীর ট্যাংক উড়িয়ে দেয়। হতচকিত ব্রিগেডিয়ার হায়াত এক সময় বুঝতে পারে তার ট্যাংক বহর আর কাজ করছে না। সে গুলি স্তব্ধ হয়ে গেছে। তখন পাক বাহিনী পিছু হটতে থাকে। একজন মুক্তিযোদ্ধা চিৎকার বলে "খানেরা ভেগে যাচ্ছে।" জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। অবশিষ্ট ট্যাংক গুলি নিয়ে মিত্রবাহিনী হামলা শুরু করে।

১৭ই ডিসেম্বের ভোর বেলা মিত্র বাহিনীর বিমান হামলা শুরু হলে পাকবাহিনীর ফ্রন্ট লাইন ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিগেডিয়ার হায়াত এক সময় বুঝতে পারে তাদের আর রক্ষা পাবার কোনো রাস্তা খোলা নাই। সকালে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পাকবাহিনীর সাথে আত্মসমার্পন করার কথা বলতে যায়। দুপুরে আনুমানিক ৩,৭০০ জন পাক আর্মি যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমার্পন করে।

স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, বিসিক শিল্প নগরীর ৪ কিলোমিটার এলাকা ঘিরে কোনো বাড়ি অক্ষত ছিল না। সমরবিদদের মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একই যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাংক, আর্টিলারি, পদাতিক এবং হাতাহাতি যুদ্ধ শিরোমণি ছাড়া অন্য কোথাও সংঘটিত হয়নি। এই যুদ্ধের কৌশল ভারত, পোল্যান্ডসহ ৩৫টি দেশের সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা কলেজে পড়ানো হয়।

তথ্য সূত্র ঃ রোয়ার

* সিনিয়র হিসাব সহকারী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১
ওজোপাডিকোলিঃ, খুলনা।

মোঃ আবুল বাশার*

স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না। সবাই চায় পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত জীবনযাপন করতে। আমাদের দেশের মানুষও পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তি ছিনিয়ে এনেছে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে। আর তা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। এজন্য এ দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর এই দিনে অর্জিত হয় মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় বিজয়। এই দিনে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্বমানচিত্রে জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাই বিজয় দিবস আমাদের আত্মমর্যাদার ও আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

প্রতিটি স্বাধীন জাতির স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত নানান ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আবেগ। তেমনই আমাদের বাংলাদেশের বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপটে রয়েছে বিপুল ত্যাগ ও সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাসের এক গৌরবময় মাইলফলক মহান ভাষা-আন্দোলন। এই আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বাঙালির ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। পরে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী জঙ্গিবাহিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম। এ পটভূমিতেই ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন স্বাধীনতা। পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বীর বাঙালি। শুরু হয়, এ দেশে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা- মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে চলে মুক্তিসেনাদের সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি জীবন বিসর্জন দেয়। অবশেষে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালির বিজয় সূচিত হয়। এই দিনে ঢাকায় ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ঘটে ইতিহাসের অন্যতম গৌরবময় ঘটনা- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মাথা নিচু করে অস্ত্র মাটিতে ফেলে আত্মসমর্পণ করে আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে।

বিজয় দিবস আমাদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এ দিনটিতে আমরা পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। ত্রিশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। অশ্রু আর রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এ স্বাধীনতা আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবের। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে নিয়ে চলেছে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পতাকা, গাইছে বিজয়ের গৌরবগাথা। তাই বিজয় দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিবছর এই দিনটি পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্ম এবং বিশ্বকে বারবার মনে করিয়ে দেয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, বীর শহীদদের কথা। আমরা অনুপ্রাণিত হই আমাদের দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা স্মরণ করে। উদ্বুদ্ধ হই অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে।

বিজয় দিবস উদযাপিত হয় মহা সমারোহে। এ দিন সারাদেশ ছেয়ে যায় লাল-সবুজের সাজে। বাড়ির ছাদে, দোকানে, রাস্তার পাশে, গাড়ির সামনে, স্কুল-কলেজে, এমনকি রিকশার হ্যান্ডেলেও শোভা পায় লাল-সবুজ রঙের জাতীয় পতাকা। প্রতিটি শহরে পরিলক্ষিত হয় উৎসবের আমেজ। রাজধানী ঢাকার রাস্তায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আয়োজন করে গণমুখী নানা অনুষ্ঠানের। স্বাধীনতার আবেগে উদ্বেলিত নরনারী উৎসবের সাজে সেজে সেখানে জমায়েত হন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এইদিন সকালবেলা ঢাকার জাতীয় প্যারেডে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কূটনীতিবিদ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষ এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন। চট্টগ্রাম এবং তার আশেপাশের এলাকা থেকে প্রতিদিন হাজার মানুষ এই মেলা দেখতে আসেন। দেশের প্রতিটি জেলায়ও উৎসবমুখর পরিবেশে এই দিনটি পালিত হয়।

বিজয় দিবস আমাদের জাতীয় দিবসসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দিবস। তবে এ দিবসটি অন্যান্য দিবসের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে। কেননা, বিজয় দিবস আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন হলেও এর সাথে জড়িয়ে আছে '৭১-এর মহান শহীদদের স্মৃতি, স্বজন হারানোর আর্তনাদ আর যুদ্ধাহত ও ঘরহারা মানুষের দীর্ঘশ্বাস। এ দিনটি শুধু আমাদের বিজয়ের দিন নয়, এটি আমাদের চেতনার জাগরণের দিন। তাই এই দিনে প্রতিটি বাঙালি নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় দেশকে গড়তে- বিশ্বসভায় সামনের সারিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে।

*উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার
(চিকিৎসা সহকারী) ওজোপাডিকো, সদর দপ্তর
বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা, খুলনা

"মা"

তাজরিন ঐশ্বর্য্য প্রভা *

মা তুমি মা
তোমার নেই তো তুলনা,
তুমি যে বটবৃক্ষের ছায়া
পৃথবীটাকে ভুলতে পারি
তবুও তোমায় ভুলবো না।
তোমার জন্য এই পৃথিবীর
দেখেছি আলো বাতাস,
এক জীবনে স্বাদ মেটেনা মাগো
তোমায় ভালোবেসে।
বিধিরে কেন দিলি জন্ম
ছোট্ট এ জীবনে,
মায়ের কোলে শেষ নিঃশ্বাস
ত্যাগ করি যেন মরণে।
মা যে আমার জনম দুঃখী
পেয়েছে অনেক তিরস্কার,
আল্লাহ তুমি আমার মাকে
দিও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

* মাতা- মোছাঃ শিরিন আক্তার লিজা
কম্পিউটার অপারেটর
আলমডাঙ্গা বিদ্যুৎ সরবরাহ

মুক্তি

উম্মে কুলসুম কুসুম*

সাল ১৯৭১

চারিদিকের গোলাগুলির শব্দে হুড়মুড়িয়ে ওঠে মালেকা বানু। তাহলে কি গ্রামে সত্যি সত্যিই মিলিটারি চলে আসলো। সেদিন তো হাসনার মা বলেছিল দেশ গাঁয়ে যুদ্ধ লাগছে। পশ্চিম গায়ে নাকি মিলিটারিরা ও চলে আসছে। তাহলে কি এবার.....!!

সে কোলে তুলে নেই চৌকির উপর ঘুমিয়ে থাকা তার ১ দিনের শিশু ছেলেটিকে। শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে লাল মরিচ বাটা আর আতপচালের ভাত নিয়ে ঘরে তার ঢোকেন মনোয়ারা বেগম। মালেকা বানুকে বলে সবাই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি আগেই কুষ্ঠ রোগে স্বামী, সন্তান হারিয়েছি। আমার আর হারানোর মতো কিছু নেই। তুমি চলে যাও তোমার বাচ্চাকে নিয়ে, দেশে থাকলে মারা পড়বে।

এর মাঝেই ঘরে ঢুকেন মালেকা বানুর স্বামী সরাফাত হোসাইন। সাথে আরো দুজন মুক্তি যোদ্ধা।

মিলিটারির তাড়া খেয়ে এখানে আশ্রয় নিতে আসেন তারা।

ঘরের দরজায় সাজোরে আঘাত করে যাচ্ছেন মিলিটারিরা। সরাফাত হোসাইন তার ছেলে, স্ত্রী ও মনোয়ারা বেগমকে লুকিয়ে রাখেন। এর মধ্য দরজা ভেঙে ঘরে ডুকে পরে মিলিটারিরা।

সরাফাত হোসাইন মুক্তিযোদ্ধাদের পালাতে সাহায্য করলে ও নিজে বাঁচতে পারে নি

মিলিটারির গুলি তার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়।

এ দৃশ্য সহ্য করতে পারে না মালেকা বানু। ছেলেকে মনোয়ারা বেগমের কাছে দিয়ে সে ছুটে আসে স্বামীর নিথর দেহের কাছে।

মুক্তি বলে চিৎকার করে উঠে। পেছনে ফিরে তাকাই মিলিটারিরা। ঠিক তখনি সে লঙ্কা গুড়ো ছুড়ে মারে মিলিটারিদের চোখে।। ছটফট করতে করতে তারা এলোপাথাড়ি গুলি করতে থাকে। একটা গুলি মালেকা বানুর বুক চিরে বের হয়ে যায়। কিন্তু থেমে যান নি মালেকা বানু। জলন্ত কেরোসিনের কুপি ছুড়ে মারে মিলিটারিদের দিকে। নিমিষেই আগুনে পুরে শেষ হয়ে যায় সব।

সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য নিয়ে কোনো রকম পালিয়ে বাঁচে মনোয়ারা বেগম। চলে যায় ইন্ডিয়া।

দীর্ঘ ৯ মাস পরে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। সবাই ঘরে ফিরে আসে। মনোয়ারা বেগম ও তার ভিটাতে পা রাখেন। সাথে মালেকা বানু ও সরাফাত হেসাইনের শিশু ছেলেটি।

মনোয়ারা বেগম তার নাম রাখেন মুক্তি।

মুক্তি ইমতিয়াজ হোসাইন ।

৪৯ বছর পর।

পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন মুক্তি ইমতিয়াজ হোসাইন। পুরো শহর সাজানো লাল, সবুজ, মরিচ বাতি দিয়ে। কেননা কাল ১৬ই ডিসেম্বর, বিজয় দিবস।।

কিন্তু তার সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। কারন আজ ও তার একটা চাকরি চলে গেছে

শুধু মাত্র ইংরেজি ভাষা ভালো ভাবে না জানার জন্য, এই নিয়ে ১১ টা চাকরি তার চলে গেলো। কারন একটাই। বাংলাটা ভালো পারলে ও ইংরেজির প্রতি অগাধ দুর্বলতা।

স্বাধীনতার এত বছর পর ও তার সুখ অধরা রয়ে গেল। এই বয়সে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে কি করবে সে! কোথায়ই বা যাবে।

রাতে বাড়ি ফিরে চিরচেনা ইজি চেয়ারটাই গা এলিয়ে দিল সে। আজ তার খুব মনোয়ারা বেগমের কথা। তার মুখে শোনা তার জন্মদাতা মা বাবার। বাংলার জন্য নয় মাসের বর্বরতার কথা।

আচ্ছা আমরা কি সত্যিই স্বাধীনতা পেয়েছি?

তাহলে কেন বিদেশি সভ্যতার কাছে হেরে যায়, হাজার হাজার বাঙালী। তাহলে ৩০ লক্ষ শহীদের মূল্য কোথায়? কেন হাজারো মালেকা বানু সরাফাত হোসাইন তাদের মূল্য পায় না?

না আর ভাবতে পারলো না সে।

ফ্যানের সাথে ঝুলতে থাকা রশিটার উপর নিজের সমস্ত ভার ছেড়ে দিল। ১২:৩০। পা ২টো স্থির হয়ে গেছে।

পুরো শহর জুড়ে রং বেরং এর বাজি, আকাশ জুড়ে ফানুশ। আর সেই পরিচিত গান, জয় বাংলা বাংলার জয়

আর অন্য দিকে অন্ধকার ঘরের কোনে একটা কোনে শেষ হলো আজও একজন মুক্তির গল্প।

* পিতাঃ মোঃ আব্দুর রব
লাইনম্যান -এ
শৈলকুপা বিদ্যুৎ সরবরাহ।

জয় উল্লাসেও কাঁন্দে মন

মোঃ আনোয়ার হোসেন*

চারিদিকে সূদন নৈরাশ্য গুম যত্রে তত্রে মানুষের শত লাশ,
লুটপাট শেষে নিবাসে অগ্নি জ্বেলেছে ওরা করেছে সর্বনাশ।
হায়েনা সেনাদের জুলুমে গেল কত শত মা বোনের প্রাণ,
প্রায়ই যামিনী চিৎকার ধ্বনি প্রহারে তনুটা হয়ে আছে খান খান।
যদি বায়স ডেকে ডেকে এসে বসে ঘরের চালে,
মা কেঁদে কয় মানিক বুঝি আর ফিরবেনা মোর কোলে।
রণ শুধুই রণ এভাবেই চলে দীর্ঘ নয় মাস ধরে,
বাঙালী শপথে বন্দী অটল প্রত্যয়ে বলে ফিরবোনা আর ঘরে।
ক্লান্তি ছেড়ে বীর সহিতে সামনে দিলো হাঁক,
একটাই বোল হবে বাংলার জয় হানাদার নিপাত যাক।
ক্লেশ ভুলে গিয়ে প্রয়াস করে হলো পাকিস্তানের অবসান,
অবশেষে হলো বাংলার জয় গগণে উড়লো নিশান।

*মিটার পাঠক (পিচরেট)
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২
ওজোপাডিকোলিঃ, কুষ্টিয়া।

বিজয় কান্না

মোঃ হাবিবুল্লাহ*

বিজয়ের কান্না কাঁদতে দাও
হারানোর বেদনা ভুলিয়ে দাও
অশ্রুজলে হাসতে দাও
আজ বিজয়ের কান্না কাঁদতে দাও।।

স্বাধীনতার শক্তি দাও
অন্ধ বিবেকের মুক্তি দাও
ক্ষুধা মুক্ত দেশ, বিশ্ব দাও
আজ বিজয়ের কান্না কাঁদতে দাও।।

বরফ গলা নদী
বইতে দাও
কষ্ট পাহাড়ের বুক চিরে ঝরণা
ঝরতে দাও
দূর্নীতি-শোষনের কালো হাত
গুঁড়িয়ে দাও
আজ বিজয়ের কান্না কাঁদতে দাও।।

*উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ও এন্ড এম, ফরিদপুর

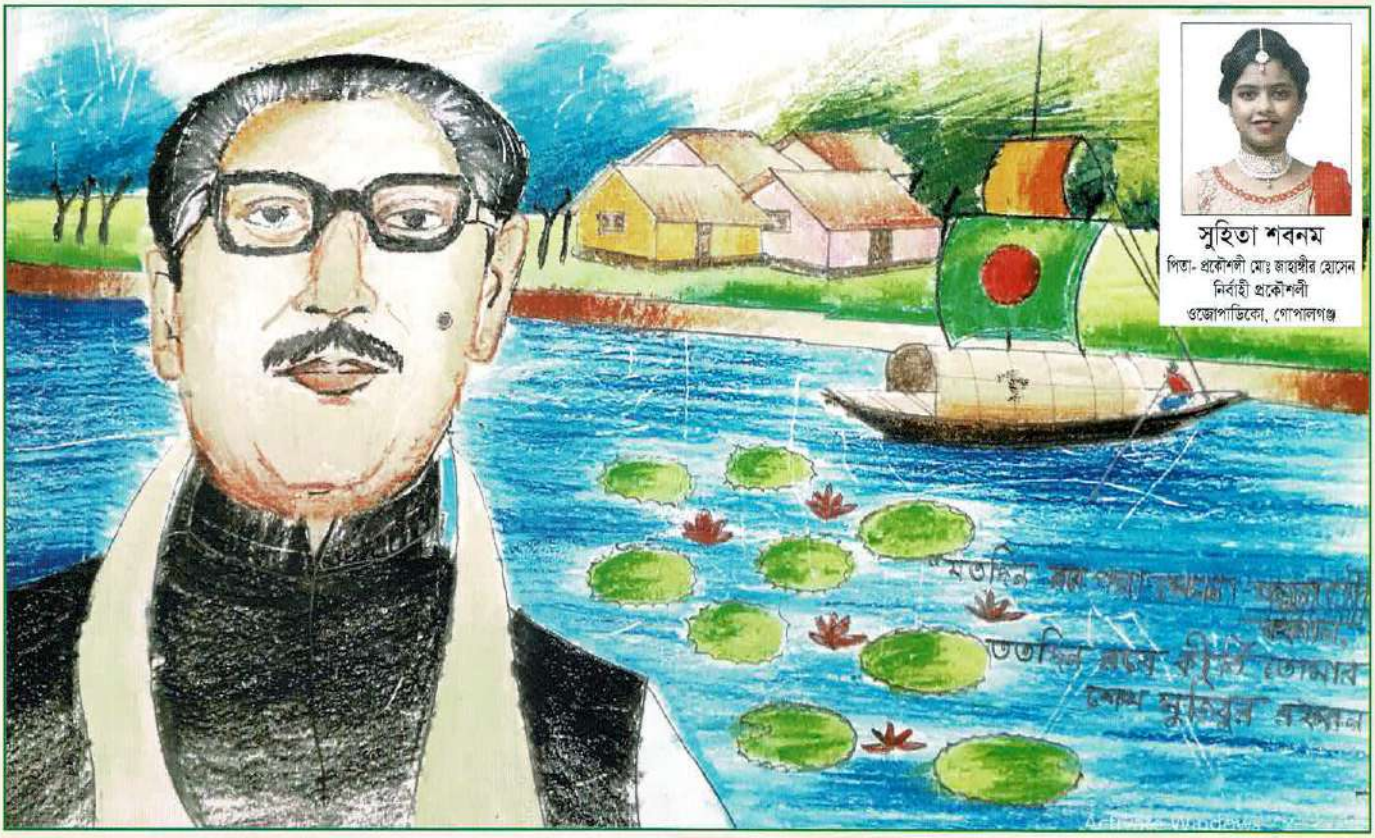

সুহিতা শবনম
পিতা- প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
ওজোপাডিকো, গোপালগঞ্জ

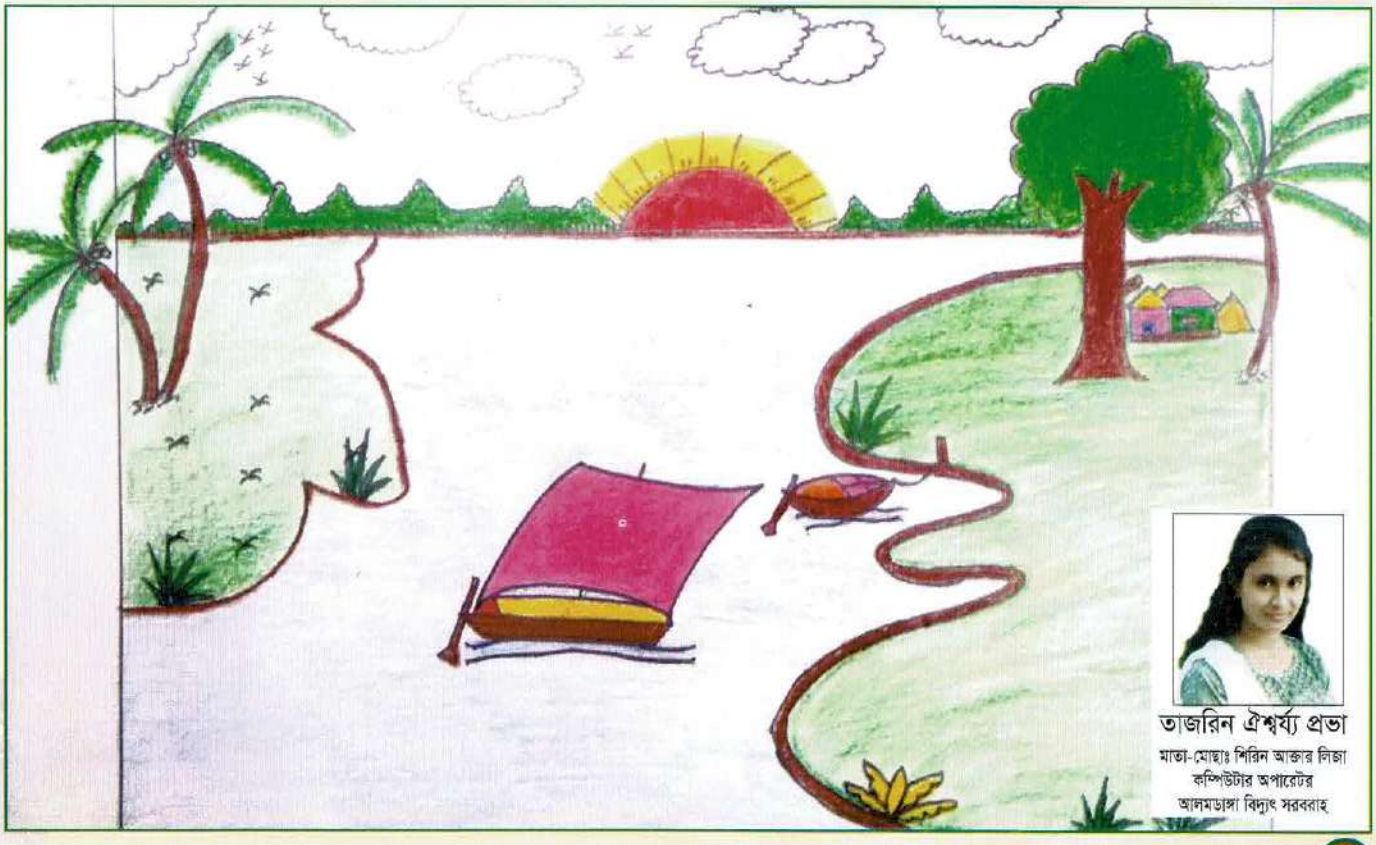

তাজরিন ঐশ্বর্য্য প্রভা
মাতা-মোছাঃ শিরিন আক্তার লিজা
কম্পিউটার অপারেটর
আলমডাঙ্গা বিদ্যুৎ সরবরাহ

চিত্র ঃ চন্দ্রমল্লিকা

নায়লা ফাতিহা আরোশ
শ্রেণী: প্রথম/দ্বিতীয়
মাতা: নুরুন্নাহার নূপুর
সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
ওজোপাডিকো, খুলনা।

“ সোলার নেট মিটার ব্যবহারে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে সবার ঘরে”

স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সাহায্য করি

- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করলে ঘরে বসেই বিদ্যুতের ব্যবহার জানা যাবে ।
- ঘরে বসেই স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারে মোবাইল এ্যাপস্ এর মাধ্যমে রিচার্জ করে বিদ্যুৎ সংযোগ সচল রাখুন।
- আপনার পরিবারের বাজেট অনুযায়ী পূর্ব থেকেই মিটারে বিদ্যুৎ ব্যবহার নির্দিষ্ট করা যাবে। ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে আপনাকে সাহায্য করবে।
- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার শর্ট সার্কিট জনিত দূর্ঘটনা রোধ করে গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার নিরাপদ রাখে।
- মিটার রিডিং ভুল ভ্রান্তি জনিত বিল হতে রক্ষা পেতে আজই স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করুন।
- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব মাশুল থাকবে না।
- মিটার প্রতিস্থাপনের সময় প্রতি গ্রাহককে অপারেটিং ম্যানুয়াল প্রদান করা হয়। ফলে গ্রাহকগণ সহজেই বিদ্যুৎ ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন।
- মিটারে ব্যালান্স শেষ হয়ে গেলে তাৎক্ষনিকভাবে মিটার হতে অগ্রীম ব্যালান্স নেয়ার ব্যবস্থা আছে, ফলে বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।
- সাপ্তাহিক ছুটি, সরকারি ছুটির দিনে এবং অফিস সময়ের পরে (বিকাল ৪:০০ টা থেকে পরদিন সকাল ১০:০০ টা পর্যন্ত) মিটারে ব্যালান্স না থাকলেও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার নিশ্চিত করুন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহযোগিতা করুন।

ওজোপাডিকো সদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

Bidyut Bhaban, Boyra Main Road, Khulna-9000, Bangladesh

Tel : + 880-41-811573, 811574, 811575, Fax : +880-41-731786

E-mail : md@wzpdcl.org.bd, wzpdcl.md@gmail.com

মু: গ্লোরি, খুলনা ০১৭১১ ২৯ ৬৬ ১৯